Vol. 11 | No. 1 | 1967

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গণজাগরণে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা।

Volume	11
Issue	1
Year	1967
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	পি. আর. বড়ুয়া
Published online	June 15, 1967
DOI	10.62328/sp.v11i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v11i1.3
Pages	87-100
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গণজাগরণে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা।

পি. আর. বড়ুয়া

বৌদ্ধ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কোন কোন মহলে এই কথাটা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে বুদ্ধ নূতন কিছু বলেননি এবং গীতার সেই চিরন্তন বাণী দিয়েই ভগবান বুদ্ধের বন্দনা করা হয়। কিন্তু "তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্" বৌদ্ধ দর্শনের পরিপূর্ণ বিরুদ্ধ মতবাদ, অধিকন্তু,

পরিত্রানায় সাধুনাম্ বিনাশায় দুস্কৃতায়
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।[১]

গীতার এই চিরন্তন বাণীর প্রথম ব্যতিক্রম হলেন ভগবান বুদ্ধ। কেননা, তিনি শুধু সাধুজনের পরিত্রাণের জন্য এবং দুস্কৃতিকারীদের নিধনের বা শাস্তির জন্য ধরায় অবতীর্ণ হননি, যেমন অন্যান্য অবতারেরা হয়েছিলেন। পুরাণে[২] বুদ্ধকে তেমন অবতার করে নিয়ে বরং তাঁকে খাটো করা হয়েছে। বুদ্ধ যদি কেবল একজন ধর্মপ্রচারকই হতেন, তা'হলে বৌদ্ধধর্ম ভারতের ইতিহাসে এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। একদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত ও চীন, ভারত ও তিব্বত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এমনকি সকল এশিয়া মহাদেশকে এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ করেছিল। ভারতের ইতিহাসে এর তুলনা মেলেনা। সাধুকে পরিত্রাণ করে কিম্বা দুস্কৃতিকারীর দণ্ড দিয়ে নয়, পরন্তু আন্তর্জাতিকতার উদার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভারতবর্ষে তিনিই একমাত্র আন্তর্জাতিক মহাপুরুষ যিনি সারা বিশ্বের দিকে ভারতবাসীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বুদ্ধ-পূর্ব যুগে ভারতবাসী ছিল শুধু ভারতেরই নাগরিক। বুদ্ধ তাদেরকে বিশ্বের নাগরিক করে তুললেন। দেশকাল জাতি-গোত্র প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ভারতবাসী

আর আবদ্ধ রইল না। তারপর থেকে ভারত সারা বিশ্বের আত্মীয় হয়ে উঠল। বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার বাণীকে বহন করে ভারত দিকে দিকে যে অভিযান চালিয়েছিল, সেই ধর্মবিজয়ের অভিযান শঙ্করাচার্যের দিগ্বিজয়ের চাইতেও অনেক বেশী। ভগবান বুদ্ধ চিরাচরিত পন্থা পরিত্যাগ করে মানুষের সামনে এক অভিনব জীবন-দর্শন উপস্থিত করেছেন। বস্তুতঃ বুদ্ধ আমাদেরকে এক নূতন মনের, এক নূতন মানসিকতার তথা এক নূতন গতিধর্মের দর্শনের সন্ধান দিয়ে গেছেন, যা তাঁর পূর্বে অন্য কোন মহাপুরুষ দিতে পারেন নি, এবং সেই জন্যই যে বৌদ্ধধর্মের আবেদন একদা এত ব্যাপক হয়ে পড়েছিল, তা বলা বাহুল্য। বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে পালিভাষার উৎপত্তি হয়েছিল একথা স্বীকার না করতে পারি কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারেই যে পালিভাষা সমৃদ্ধি-শালী হয়েছিল এবং বিরাট পালি সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বৈদিক ঋষিরা একদিন মানুষকে "অমৃতের পুত্র" বলে সম্বোধন করেছিলেন :—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূ ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহ'তি মৃত্যুমেতি
নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥[৩]

কিন্তু মানুষ সে বাণী বিস্মৃত হয়ে "কর্মকাণ্ডকে"ই ধর্ম ও জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করল। কিন্তু সিদ্ধার্থ যেদিন বোধিদ্রুম-তলে সম্যক সম্বোধি লাভ করলেন, সেই দিন থেকে জগতের কল্যাণ সাধনকেই জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করলেন। সর্বজীবে মৈত্রী ও করুণা, প্রেম ও দয়া, শান্তি ও শৃঙ্খলা এইদিকটাই বুদ্ধজীবনে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে। জৈন ও অন্যান্য ধর্মসম্প্র-দায়ের ন্যায় সম্প্রদায় গঠন না করে (অবশ্য পরে বৌদ্ধসম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল) ভগবান বুদ্ধ নগরের কোলাহল থেকে দূরে এক দল গৃহছাড়া মানুষকে নিয়ে যে ভিক্ষু সম্প্রদায় গড়ে তুললেন, তাঁদের শিক্ষা দীক্ষায় ও আচার ব্যবহারে এমন এক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হলো যার প্রভাব ভারতের শিল্পে,

সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও দর্শনে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়ে রইল। এইখানেই বৈদিক ভারতের সঙ্গে বৌদ্ধ ভারতের সংঘাত। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রকে বৌদ্ধ সংঘে সবচেয়ে উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছিল। ভারতের ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে এর তুলনা মেলে না। খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতকে হর্ষবর্দ্ধনের শাসনাবসানে বৌদ্ধধর্ম যখন রাজপৃষ্ঠকতা হারালো, তখন দক্ষিণ থেকে কুমারিকা ভট্ট ও শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ তথা বর্ণ-হিন্দুদের যে অভিযান বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল, তাতে বৌদ্ধদের ঝাড়ে বংশে নির্মূল করার চেষ্টাই চলেছিল। এই শত্রুতার মূল কোথায়? বৌদ্ধধর্মের বিপ্লবী মতবাদের জন্য নয় কি?

ভগবান বুদ্ধ মানবসভ্যতার বাল্যেই মানুষকে দিয়েছিলেন মাথা তুলে দাঁড়াবার মত অনুপ্রেরণা। ঈশ্বর-সান্নিধ্য বা স্বর্গলাভের প্রলোভন তিনি দেখান নি। দুঃখ ও বঞ্চনাকে তিনি অদৃষ্টের নির্বন্ধ বলে মানুষকে বোঝান নি। তিনি প্রেম, মৈত্রী, প্রজ্ঞা ও বিনয়ের মাধ্যমে মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে বলেছেন। তিনি অহিংসাকে গ্রহণ করতে বলেছেন মূলমন্ত্র রূপে, দৃঢ় করতে বলেছেন নৈতিক চরিত্রকে শীলের মাধ্যমে। কেননা, এই দুঃখময় সংসারে সুখ সকলেরই কাম্য, কিন্তু সে সুখ শুদ্ধ জীবনযাপন ব্যতীত লভ্য নয়। শীল প্রতিপালনের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:—"শীল গ্রহণ করার মানেই হচ্ছে মুক্তিলাভের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে উঠে। শীল আমাদের চলার সম্বল।" এই কথার সমর্থনে তিনি কয়েকটী শীলের উল্লেখ করেছেন, যথা পানং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, ন চাদিন্নমাদিয়ে, যা' তোমাকে দেওয়া হয়নি তা' নেবে না, মুসা ন ভাসে, মিথ্যা বলবে না, ন চ মজ্জপো সিয়া, মদ্যপান করবে না ইত্যাদি। এই ভাবে একটি একটি শীল সঞ্চিত হলে কি হয়? মহামঙ্গল হয়। মহামঙ্গল বলতে ভগবান বুদ্ধ কি বুঝতেন, তা' অনেক বুদ্ধ-বচনের মধ্যে মাত্র একটি বুদ্ধ বচন উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে। লাভ-ক্ষতি, নিন্দা-প্রশংসা, উত্থান-পতন, জীবন-মরণ প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েও যার চিত্ত-প্রকশিত হয় না, যার শোক নাই, মালিন্য নাই, ভয় নাই, তিনিই এই উত্তম মঙ্গলের অধিকারী হয়েছেন। এই মঙ্গল লাভ কখনও সম্ভব নয় যদি

মন থেকে ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হয়। ইউ-রোপীয় পণ্ডিত Dr. E. J. Thomas বলেছেন :—"It is on the side of morality that Buddhism is best known in the West and it is on this side that the greatness and originality of the Founder's system is seen, whether considered in its historial development in discarding or reforming current views orin relation to other systems that make a definite progress in the ethical ideals of humanity."[৪]

মানুষের সম্মুখে দুইটী ভিন্নমুখী পথ খোলা আছে। চাওয়া ও হওয়ার পথ, প্রেয় ও শ্রেয়ের পথ। বালক নচিকেতা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জানতে চেয়েছিল মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসাকে, কিন্তু যম বালক নচিকেতাকে প্রলোভিত করার জন্য বলেছিলেন : "নচিকেতা, নহি সুজ্ঞেয় মনুরেষা ধর্ম্মঃ। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। মানুষ যা চায় তাই চাও—শতায়ু, পুত্র, পৌত্র, গো, অশ্ব, হিরণ্য ইত্যাদি। চেয়ে নাও পৃথিবীজোড়া রাজ্য, অনন্ত কাল জীবিত থাকবার প্রার্থনা জানাও।" কিন্তু নচিকেতা এই সব কিছুই প্রার্থনা করলেন না। তিনি বললেন : "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।" তিনি বললেন : "মৃত্যু সমস্তই গ্রাস করে। প্রেয় মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।" মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষ যদি মৃত্যুর ঊর্ধ্বে উঠতে চায় তা'হলে তাকে চলতে হবে শ্রেয়ের পথে। এই শ্রেয়ের পথই বুদ্ধ দেখালেন তাঁর বাণী প্রচার করে। সেই পথ হলো পুরুষার্থের পথ এবং তার নাম হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। বৌদ্ধধর্মে আদর্শ পুরুষ ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যেন পরস্পরে মিলেমিশে একখানি monolythic শিলাফলকে পরিণত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মনঃসমীক্ষা, সুসমঞ্জস পবিত্র জীবন, বিশ্বজনীন কল্যাণ ব্রত —এই সকলের সমন্বয়ে বৌদ্ধধর্মে যে আলেখ্য রচিত হয়েছে, তা' সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্বেও যেমন, আজও তেমনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরিপূর্ণতায় দেদীপ্যমান। বস্তুতঃ এই পরিপূর্ণ সুষমার সূচনা হলো ভগবান বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির সহিত রজত শুভ্র পূর্ণিমার সংযোগ।

আজ হতে আড়াই হাজার বৎসরেরও আগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভাগে মানবের চিন্তাজগতে এক বিরাট বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আলোড়ন

এসেছিল। মহাভাবের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল সারা দেশ। সেই সময় চীনে কনফুসিয়াস্, পারস্যে জরাথুষ্ট্র, গ্রীসে পিথাগোরাস্ নূতন ধর্মতত্ত্বকে আহ্বান জানাতে লাগলেন। তখন ভারতেও নবধর্মের বাণী নিয়ে এলেন জৈন মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। মানুষ ভেবেছিল যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডেই খুলে দেবে স্বর্গের দুয়ার। ভেবেছিল আদর্শের প্রয়োজন নেই বরং নির্ভুল ক্রিয়াই আদর্শের তৃষ্ণা পূরণ করবে। আরও ভেবেছিল মন্ত্রের দ্বারাই অর্জন করবে পুণ্য, কর্মের দ্বারা নয়। তাই যজ্ঞাধিকারীর জন্য কেনা রইল স্বর্গ। বিপুল অর্থব্যয়ে রচিত হত সেই যজ্ঞের সোপান, আর অজস্র পশুবলির রক্তে রঞ্জিত হত সে সোপান। কিন্তু বুদ্ধ বললেন বেদবিহিত যাগযজ্ঞ সব নিষ্ফল, মিথ্যাদৃষ্টি। তিনি বললেন জগজ্জয়ের চাইতে আত্মজয় বড়। সকল জীবের প্রতি ভালবাসার চাইতে বড় ধর্ম কিছু নেই। জন্ম নয় কর্মই বড়। তোমার কর্মই তোমাকে নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার প্রতি মুহূর্তের কর্ম পর মুহূর্তের পরিণামকে জন্ম দিচ্ছে, সম্ভব করে তুলছে নূতন বাসনার ও নূতন সংস্কারের। তিনি বললেন, ঈশ্বর আছেন কি নাই সে তর্ক বৃথা। আত্মা নিয়ে তর্কবিতর্কের বেড়াজাল নিতান্তই নিষ্ফল। আসলে ঐ সব তত্ত্বকথার আড়ালে মানুষ নিজেকে লুকিয়ে রাখে। নিজেকে নিজে ফাঁকি দেয় মাত্র। ঈশ্বরের সন্ধান পাবার জন্য কষ্টকর তপস্যায় শরীর ও মন নষ্ট করা অথবা যজ্ঞক্রিয়া ও পশুবলির দ্বারা অসংখ্য জীবের প্রাণ নাশ করে পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করা একান্তই নিরর্থক ও বাতুলতা মাত্র। কারো দেহে যদি বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়, তা' হলে প্রথম কর্তব্য কি হবে? আগে সেই তীর তুলে ফেল্‌তে হবে, নাকি কে তীর ছুড়েছে, তার বাস কোথায়, সে হ্রস্ব কি দীর্ঘ, ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, এই সব বসে বসে পর্যালোচনা করবে? বুদ্ধ বললেন, রোগের মূল ধরেই চিকিৎসায় মনোনিবেশ করতে হবে। মানুষের দেহমনে কামনা-বাসনার তীক্ষ্ণ, তীব্র বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়েছে। সেই তীর তুলে ফেলে ক্ষতস্থান নিরাময় করতে হবে। সুচিকিৎসায় ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করবে। এই বাসনা-ব্যাধি নিরাকরণের ও দুঃখজ্বালা-দহনের নির্বাণের একমাত্র ভৈষজ্য হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যার সম্যক উপলব্ধি চতুরার্য্য সত্যে। চিত্তকে আসক্তিশূন্য ও বাসনাশূন্য

করে তাকে পূর্ণ করতে হবে মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা এই চতুর্গুণবিশিষ্ট রক্ষাকবচে।[৬]

ভগবান বুদ্ধ অনেকদিনের রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করে দিয়ে জাতের বৈষম্য ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষকে তার সহজ সত্য আসনে স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আহ্বান জানালেন। বুদ্ধই বিশ্বের প্রথম মানব যিনি ধর্মকে গোষ্ঠীর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়"[৭] সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর মৈত্রী বিশ্বজনীন, তাঁর করুণা সর্বজীবে। ধর্মে অধিকারীভেদ তিনি মানেন না। তাঁর মতে ধর্ম সকল কালের সকল মানবের প্রয়োজনেই রচিত। আধ্যাত্মিক জল্পনা-কল্পনার দার্শনিক তর্কজাল পরিত্যাগ করে ধূলির ধরণীর দিকে দৃকপাত করার জন্য তিনি আহ্বান জানালেন। তাই তাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হলো সাম্যবাদের অমৃতময়ী বাণী। সে বাণীপ্রচারের জন্য তিনি অস্ত্রধারণ করেন নি। এ জন্য কৈতরের দরকার হয় নি—কোন ছলনাময় পথ তিনি বেছে নেন নি, মানুষের মনের কাছে আবেদন জানালেন। আত্মসচেতনতার দীক্ষা সর্বপ্রথম তিনি মানুষকে দিয়েছেন। বস্তুতঃ প্রেম দিয়ে যে মানুষের মন জয় করা যায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলেন ভগবান বুদ্ধ। সাধারণকে সহজে বশীভূত করার জন্য বুদ্ধশিষ্যরা যেন কোন অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে আশ্রয় না নেন, এই ছিল তাঁর নির্দেশ।

বুদ্ধ গণজাগরণের অগ্রদূত। তিনি মানবকে দীক্ষা দিলেন মহা মৈত্রীর মন্ত্রে। এই তাঁর বিদ্রোহ। জননী তাঁর একমাত্র সন্তানের প্রতি যেরূপ ভালবাসা পোষণ করেন, সেইরূপ সর্বজীবের প্রতি ভালবাসা পোষণ করার নাম মৈত্রী। নিখিল চিত্তের সুরের সঙ্গে ব্যক্তির চিত্তের সুরকে মিলিয়ে এক মহা ঐক্যতান তুলতে হবে। পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে নিতে হবে। অপরকে নিজের কাজের শরীক করার মধ্যে চিত্তের বিস্তার সাধন করতে হবে। প্রেমের সঙ্গে মৈত্রীর অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ। প্রেমের উপর যে ধর্মের ভিত্তি, সে ধর্মে মৈত্রীর সুখ যে স্বাভাবিক নিয়মে আসবে তা বলা বাহুল্য। সে প্রেমেরই নামান্তর অহিংসা। যজ্ঞে বলি দিবার জন্য আনীত ছাগশিশুর প্রতি করুণাপরবশ হয়ে যজ্ঞকারী রাজার নিকট সিদ্ধার্থ নিবেদন করছেন:

জীবগণ হিংসি পরস্পরে ভাসে মহাদুঃখের সাগরে,
হিংসায় কি কভু হয় ধর্ম উপার্জন ?
দেবতুষ্ট হিংসায় কি হয় ? মহাশয় জানিহ নিশ্চয়
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।[৮]

সে অহিংসা এইরূপ :—মাতা যেমন একমাত্র পুত্রকে আপন প্রাণ দিয়েও রক্ষা করেন, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিসীম মৈত্রীভাবাপন্ন হতে হবে। ঊর্ধ্বে, অধোভাগে, চতুর্দিকে, নিখিল প্রাণীগণের প্রতি অপরিমিত হিংসাশূন্য, বৈরহীন, স্বার্থদ্বন্দ্ব-বিরহিত মানসে অপরিসীম মৈত্রী জন্মাতে হবে। দাঁড়ান, বসা, শোওয়া, অথবা চলমান অবস্থায় যাবৎ নিদ্রা না আসে, তাবৎ এই মৈত্রীর ভাবে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে। এই জগতে এটাই হলো ব্রহ্ম-বিহার বা শ্রেষ্ঠ-বিহার।[৯] ধর্মপদ বলেন—"শত্রুগণের মধ্যে আমরা শত্রুহীন হয়ে সুখে বিচরণ করি। এসো, বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা বিদ্বেষহীন হয়ে বিচরণ করি। আতুরগণের মধ্যে আমরা অনাতুর হয়ে সুখে জীবন যাপন করি। এস, দুঃখক্লেশক্লিষ্ট মনুষ্য-গণের মধ্যে আমরা দুঃখ-ক্লেশাতীত হয়ে বিচরণ করি। আসক্তগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হয়ে সুখে বাস করি। এস, লোভমোহগ্রস্থ মানুষগণের মধ্যে আমরা লোভমোহমুক্ত হয়ে বিচরণ করি।"[১০] অর্থাৎ সর্বলোক বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্ন চিত্তে স্ফুরিত করে মৈত্রী সহগত চিত্তে অবস্থান করতে হবে। বৈরে বিভ্রান্ত, লোভ-দ্বেষ-মোহ-মান প্রভৃতি ক্লেশে ক্লিষ্ট, ঔৎসুক্যে কাতর মনুষ্যলোকে নির্বৈর, অনাতুর, অনুৎসুক দৃঢ়-স্থির চিত্তভূমিই পরমার্থ। ভগবান বুদ্ধের উপসংহার-বাণী তাই নির্দেশ করে "অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরনা অনঞ্ঞসরনা, ধম্মদীপা বিহরথ ধম্মসরনা নো অপটীসরনা" অর্থাৎ তোমরা আত্মদীপ ও আত্মশরণ হও, বাহ্যসহায়ের মুখাপেক্ষী হবে না, সত্যকে দীপজ্ঞানে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন কর এবং সত্যেই মুক্তিকে অন্বেষণ কর। দেহধারী শ্রমণ দেহকে এই দৃষ্টিতে দেখবেন যেন উদ্যমী চিন্তাশীল ও অপ্রমত্ত হয়ে যাবৎ সংসারে বিচরণ করবেন তাবৎ দেহের বাসনা থেকে যে দুঃখ তাকে যেন জয় করতে পারেন। কাম মানুষকে পৃথিবীর বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, যতই কামকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করা যায় ততই তা বেড়ে চলে। সেইজন্য ভগবান বুদ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

ন কহাপন বসসেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি
অপ্পস্সাদা দুঃখা কামা ইতি বিঞায় পণ্ডিতো,
অপি দিব্বেসু কামেসু রতিং সো নাধিগচ্ছতি,
তন্হক্খয়রতো হোতি সম্মা সম্বুদ্ধ সাবকো ॥[১১]

কার্ষাপণ বর্ষণে অর্থাৎ প্রচুর অর্থব্যয়েও কামের পরিতৃপ্তি হয় না। এই কাম অল্প আস্বাদযুক্ত এবং দুঃখদায়ক, পণ্ডিতগণ এটা জেনে দিব্যকামেও অভিলাষ করেন না এবং সম্যক বুদ্ধের শিষ্যগণ তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন।

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ বা মার্কস্‌বাদের গোড়ার কথা হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন। আড়াই হাজার বছরেরও আগে ভগবান বুদ্ধ সংঘের আইন কানুন রচনা করতে গিয়ে সেই একই নীতি গ্রহণ করেছিলেন একথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। আড়াই হাজার বৎসর আগে বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘে এক ধরনের সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছিল যার পেছনে কোন অর্থনৈতিক তাগিদ ছিল না। আধ্যাত্মিক সাধনা ও মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে একদল গৃহহীন সংসার-ত্যাগী পুরুষ নগরের উপকণ্ঠে নির্জনে অধ্যাত্ম ধ্যানসাধনায় জীবন অতিবাহিত করতেন। তাঁদের সংঘের নিয়নকানুন ও তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আচার ব্যবহার দীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসর পরে এই উন্নত বিজ্ঞানের যুগেও মানুষের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বৌদ্ধ সংঘভুক্ত ভিক্ষুরা গৃহত্যাগ করে এসেছিলেন সত্য, কিন্তু বিহারে এসে তাঁরা নূতন করে আবার ঘর বেঁধেছিলেন, অবশ্য গৃহীদের মতো স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে নয়। বিহারে ও সংঘারামে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে জ্ঞানের ও সাধনার স্তর অনুসারে তাঁদের মর্যাদারও তারতম্য ছিল। কিন্তু বিহারে তাঁরা প্রত্যেকেই ভিক্ষু এবং প্রত্যেকের অধিকার সমান।[১২] সংঘে ব্যক্তিগত অধিকার বা individual rights প্রত্যেক ভিক্ষুরই সমান। কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে প্রত্যেকের মতামত নেওয়া সংঘের অবশ্য কর্তব্য ছিল। অন্য কথায় কোন প্রস্তাবকে নাকচ করার ক্ষমতা (right to veto) প্রত্যেক ভিক্ষুরই ছিল। সুতরাং বৌদ্ধ সংঘে শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রকেই আমল দেওয়া হয়নি। অধিকন্তু ব্যক্তিগত মতামতকে চরম সম্মান দেওয়া হয়েছে।

এইরূপ নিয়মকানুন প্রবর্তনের মধ্যে যেটা ছিল আসল তাগিদ, সেটা হলো সংসারের সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগতিক কারণে যেসব ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা ও দলাদলির সৃষ্টি হয়, তার মূলে কুঠারাঘাত করা। কাজেই এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে প্রধান হাতিয়ার হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করা। বুদ্ধ তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যত অনর্থের মূল এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়ে রাখলে গেলে চাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন। বৌদ্ধ সংঘের লক্ষ্য যাই হোক না কেন, মানুষের কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন আছেই—যেমন ভিক্ষুদের বাস করার জন্য গৃহ এবং শোওয়া, বসা, খাওয়া ও পরার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ইত্যাদি— গৃহীর প্রয়োজনের তুলনায় সে যত সামান্যই হউক না কেন। বুদ্ধ নিয়ম করলেন পরিধানের চীবর, ভিক্ষাপাত্র ও কয়েকটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ ব্যতীত আর সবই হবে সংঘের সাধারণ সম্পত্তি (common property), অর্থাৎ তাতে কোনো ভিক্ষুর ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না। যে ভিক্ষু যতক্ষণ বিহারের কোন একটি ঘর বা কোন একটি আসবাবপত্র ব্যবহার করবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেটী তাঁর বলে গণ্য হবে। কিন্তু তিনি সেই বিহার ত্যাগ করে অন্য বিহারে বা অন্যস্থানে চলে গেলে সেই দ্রব্যটীর উপর তাঁর কোন অধিকার আর থাকবে না। নবাগত ভিক্ষু সে দ্রব্যটী বা সে ঘরখানি ব্যবহার করতে পারবেন। গৃহস্থ উপাসক-উপাসিকারা সংঘকে যা কিছু দান করতেন, সেইগুলি সব এইভাবে সংঘের সাধারণ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হত। তাতে কারও ব্যক্তিগত বা স্থায়ী অধিকার ছিল না। এইজন্যই বুদ্ধ নিজেও সংঘের আর সকলের মত ঐ একই পথের পথিক মাত্র। হয়তো অন্যের চাইতে তিনি বেশী কিছু পথ অতিক্রম করেছেন। সেইজন্য বিরোধী দলের নেতা দেবদত্ত যখন তাঁর হাতে সংঘের পরিচালনভার অর্পণ করতে বললেন, তখন বুদ্ধ বললেন —"আমি সংঘ দান করবার কে? সংঘের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করবার ক্ষমতা সদস্যদেরই আছে।" মৃত্যুর পূর্বেও তিনি তাই কোন ব্যক্তিকে সংঘের ভাবী কর্তারূপে বা সংঘনায়করূপে (successor) নিযুক্ত করে যাননি। তাঁর অনুশাসনই হবে সংঘের নিয়ামক, এটাই ছিল শিষ্যদের প্রতি তাঁর নির্দেশ।[১৩]

বৌদ্ধ সংঘে Parliamentary life কিভাবে কাজ করতো তা' দেখাবার জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁর Discovery of India নামক গ্রন্থে Lord Zetland এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। Lord Zetland বলেছেন :—"And it may come as a surprise to many that in the Assemblies of the Buddhists in India two thousand or more years ago are to be found the rudiments of our parliamentary practice of the present day. The dignity of the Assembly was preserved by the appointment of a spceial officer—the embryo of Mr. Speaker in the House of Commons. A second officer was appointed to see that when necessary a quorum was secured—the prototype of the parliamentary chief whip in our own system··· If discussion disclosed a difference of opinion, the matter was decided by the vote of the majority, the voting being by ballot."[১৪]

বৌদ্ধ সংঘে সকলের সমান অধিকার। যারা যুগ যুগ ধরে সমাজে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অস্পৃশ্য বলে উপেক্ষিত, তারাও ভগবান বুদ্ধের কৃপালাভে বঞ্চিত হয়নি। ব্রাহ্মণ ভিক্ষু শারিপুত্র ও নাপিত ভিক্ষু উপালির মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। গঙ্গা, যমুনা, সরযু, সরস্বতী, অচিরাবতী, মহানদী প্রভৃতি বড় বড় নদী যেমন নানা দিক বিদিক থেকে উৎপন্ন হয়েও সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয় এবং আপনাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও নাম হারিয়ে ফেলে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকল জাতির মানব এই ধর্ম গ্রহণ করা মাত্র তাদের পূর্বনাম ও গোত্র হারিয়ে ফেলে।[১৫] পুরুষও যেমন নারীও তেমনি আপনার পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল ভোগ করে। মুক্তির পথে তাঁর নিজস্ব কর্মফলই তার সহায়। পালি সংযুক্ত নিকায়ে[১৬] বর্ণিত হয়েছে যে নারীই হোক আর পুরুষই হোক সকলের জন্য রথ অপেক্ষা করে থাকে। ঐ রথেই তাঁরা সকলে নির্বাণ মার্গে পৌঁছাতে পারেন। ভিক্ষুণী পদে বৃত হয়ে বিম্বিসার মহিষী ক্ষেপা ও গণিকা আম্রপালী সংঘে সমান অধিকারই লাভ করেছিলেন। মহা উপাসিকা বিশাখার দান ও চণ্ডাল-নন্দন মাতঙ্গের দান সমভাবেই গৃহীত হয়েছিল।

বিশ্বমৈত্রী-প্রচারক বৌদ্ধগণের শিক্ষার দ্বার জাতিধর্ম ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই সমভাবে উন্মুক্ত ছিল। সংঘে ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদিগের শিক্ষা পদ্ধতিতে কোন প্রভেদ ছিল না। তার ফলেই এটা নিঃসংশয়েই বলা চলে যে নারীরা আত্ম-সম্মানে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন।[১৭] আম্রপালী নামে বৌদ্ধ ভিক্ষুনীর পূর্ব জীবন বৃত্তান্ত বৌদ্ধ সাহিত্যে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বৈশালী নগরীর এই অলোক-সামান্যা রূপলাবণ্যবতী নৃত্যগীতপটীয়সী নগরশোভিনী ঘটনাচক্রে বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হন।[১৮] ভগবান বুদ্ধ যখন ঐ অঞ্চলে গিয়েছিলেন, তখন আম্রপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় মহাপ্রতাপশালী লিচ্ছবি গণরাজগণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি।[১৯] অবদান-শতকের যে কাহিনীটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ "নটীর পূজা" নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন, তাতেও বর্ণিত আছে রাজবাড়ীর শ্রীমতী নামে একজন নটীকে রাজা বিম্বিসারের রাজ্যোত্থানের বৌদ্ধস্তূপে পূজার ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল। চরম আত্মদানের দ্বারা সে পূজা অমর হয়ে আছে[২০] :—

সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্তলিখা,
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপ-পদ মূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।

বস্তুতঃ ভগবান বুদ্ধের জীবন অত্যাচারিত ও পতিতাদের উদ্ধারের মহিমায় মহিমান্বিত। এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এমন মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বুদ্ধ-পূর্ব যুগে স্বর্গলাভের জন্য পুত্রের প্রয়োজন অত্যধিক ভাবে আরোপিত হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধমতে পুত্র ও কন্যার এই প্রভেদ স্বীকৃত হয়নি। তাতে নারীর সম্মান সমাজে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজে যদিও বিভিন্ন স্তরের নারীদের প্রভেদ দূর হয়নি, তথাপি যাঁরা সৎজীবন গ্রহণ করতেন তাঁদের মধ্যে কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রভেদ ছিল না।[২১] সুতরাং অত্যাচারিত বন্ধ্যা, সন্তানহীন বিধবা ও স্বামীর বিরাগভাজন নারীদের জন্য এটা নিঃসন্দেহে একটা মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং তাদের অসহায়ত্ব বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়েছিল। বেদ-উপনিষদের যুগে ব্রাহ্মণ্য সমাজে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে নারীর স্থান ছিল পুরুষের পরে। বন্ধ্যা ও বিধবা প্রভৃতির এই সব অনুষ্ঠানে

প্রবেশাধিকারই ছিল না। কিন্তু ধর্মসাধনায় পুরুষের এইরূপ অগ্রাধিকার বৌদ্ধ মতে স্বীকৃত হয়নি। সেইজন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাশী, কোশল, অঙ্গ মগধ, বৃজি, মল্ল, শাক্য ও কোলীয় প্রভৃতি সমাজ আর্যাবর্তে বুদ্ধের ধর্ম বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত ছড়িয়ে পড়ল এবং বহু রাজ-রাজেশ্বর ও ধনাঢ্য ব্যক্তি বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করে কৃতার্থ হলেন। বুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত সংঘের বিপুল আহ্বানে সেইদিন সহস্র সহস্র নরনারী সাড়া দিয়েছিলেন মুক্তির সন্ধানে। মহাভারতে নারীদের "গৃহদীপ্তয়ঃ" গৃহের দীপ্তিস্বরূপা বলে বন্দনা করা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ যুগে নারীরা কিভাবে সমগ্র দেশের দীপ্তিস্বরূপ হতে পেরেছিলেন তার বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থেরীগাথা ও তার ভাষ্য নামক উপাদেয় পালিগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। বস্তুতঃ থেরীগাথা পালি সাহিত্যে একখানি অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ।[২১]

থেরীগাথা ছাড়াও অপদান নামক অপূর্ব পালি কাব্যগ্রন্থে ও কোন কোন থেরী রচিত গাথা রচয়িত্রীর জীবনীসহ লিপিবদ্ধ আছে। তাতে দেখা যায় কিরূপ সম্প্রদায় থেকে এবং কি কারণে রমণীগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। সকল থেরী যে শুধু ধর্মজীবন যাপন করার জন্যই সংসার ত্যাগ করেছিলেন তা' নয়। পরন্তু অন্যান্য বহুবিধ কারণও বিদ্যমান ছিল। প্রব্রজ্যা গ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় কেউ পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্যে বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, কেউবা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ পতিগৃহে নির্যাতিতা হয়েছেন। এরূপ অবস্থায় বিপর্যয় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাঁরা গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ থেকে আরম্ভ করে সর্বনিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত সকল স্তরের নারী—ব্রাহ্মণকন্যা, রাজকন্যা, শ্রেষ্ঠিদুহিতা, ব্যাধকন্যা, অস্পৃশ্যা শবরকন্যা, কর্মকার-দুহিতা, বারবণিতা প্রভৃতি সকলেই কেউ কৌমার্যে, কেউ যৌবনে, কেউ প্রৌঢ়ত্বে, কেউ বা বার্দ্ধক্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। ধর্মাশ্রিত জীবনই একমাত্র শান্তিলাভের উপায় বিবেচনা করে তাঁরা সংঘে দীক্ষালাভ করেছিলেন।[২২] আসলে বৈদিক ক্রিয়ালাভের আতিশয্য, যজ্ঞ ও পশুবলির বীভৎসতা, অথবা পুরোহিততন্ত্রের গণবিরোধী আন্দোলন—শুধু এইগুলিই বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা নয়, পরন্তু এক বৃহৎ দর্শন, এক অশ্রুতপূর্ব মানবতা ও মানবিক চেতনা বৌদ্ধ ধর্মকে যে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যদান করেছে এটা নিশ্চিতরূপেই বলা চলে এবং সেইজন্যই একদা বৌদ্ধধর্মের আবেদন এত ব্যাপক হয়ে উঠেছিল।

বুদ্ধপূর্ণিমা-উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলেনা। ক্ষমাই আনে শান্তি। একথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে, ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়েই চল্‌বে। রাষ্ট্রবিরোধের আগুন কিছুতেই নিভবে না। .....পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধি লাভের দুরাকাঙ্খাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন—অক্কোধেস জিনে কোধং—আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী অপমানের যুগে বলবার দিন এল "বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি"। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছিলেন।"[২৩]

অপরিমিত মানসে প্রীতিভাবে ও মৈত্রীভাবে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাকে ভগবান বুদ্ধ "ব্রহ্মবিহার" বলেছেন। জগতে আজ এই ভাবের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা' বলাই বাহুল্য। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকেও কি ভাবে তথাকথিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানব স্বীয় প্রজ্ঞাবলে আপনার চরম বিকাশ, প্রগতি ও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো এই বৌদ্ধধর্ম, যে ধর্মকে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—"আদি কল্যাণং মজ্‌ঝে কল্যাণং পরিয়োসান কল্যাণং"—যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তেও কল্যাণ[২৪]—এমন কল্যাণ-সুন্দর ধর্ম জগৎবাসীকে মানব-কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করুক, বিশ্বজগতে পরম কল্যাণ সিঞ্চিত করুক—এই কামনা করি আর কবিগুরুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলি: [২৫]

ওই নামে ধন্য হলো একদিন দেশে দেশান্তরে
তব জন্ম ভূমি
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে,
দান কর তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনে মহা জাগরণ,
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এদেশে তোমার স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।।

নির্দেশিকা

১। শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা, ৮ম অধ্যায়, 8 শ্লোক।

২। বিষ্ণু-পুরাণ দ্রষ্টব্য।

৩। বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ ১, ১, ১৫।

৪। Dr. E. J. Thomas, The Life of Buddha as Legend and History, 2nd edition, London, 1933, p. 175.

৫। মজ্‌ঝিম—নিকায়, ১ম খণ্ড, চূল মালুষক্য-সুত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, অগ্‌গিবচ্ছ গোত্ত-সুত্ত।

৬। খুদ্দক-পাঠ, করণীয় মেত্ত—সুত্ত, ৯।

৭। বিনয়-পিটক, ১ম খণ্ড, মহাবর্গ, ১, ১৪।

৮। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বুদ্ধদেব-চরিত (নাটক)।।

৯। সুত্ত-নিপাত; সেত্ত-সুত্ত, ১/৮।

১০। ধম্মপদ, সুখবগ্‌গ, ১৫/১৩।

১১। ধম্মপদ, বুদ্ধবগ্‌গ, ১৪/৮, cf. মন্ধাতু-জাতক।

১২। বিনয়-পিটক, ২য়, খণ্ডক; G. D. De. Democracy in Early Buddhist Sangha, Calcutta, 1953.

১৩। দীঘ-নিকায়, মহাপরিনিব্বান সুত্ত, ৫ম অধ্যায়।

১৪। The Mahabodhi; June-July, 1954, p. 205.

১৫। উদান ৫।

১৬। সংযুক্ত-নিকায়ে, ১ম, খণ্ড, দেবতা-সংযুত্ত।

১৭। থেরীগাথা ও তার ভাষ্য পরমত্থদীপণী দ্রষ্টব্য।

১৮। বিনয়-পিটক, ৮ম অধ্যায়।

১৯। মহাপরিনির্ব্বাণ-সূত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

২০। পূজারিণী কাব্য।

২১। অপদান, থেরী-অপদান।

২২। টীকাকার ধর্ম্মপালকৃত পরমত্থদীপণী দ্রষ্টব্য, মনোরথ-পূরণী দ্রষ্টব্য।

২৩। ১৩৪২ সালে বুদ্ধপূর্ণিমা-উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ, প্রবাসী, ১৩৪২ সাল।

২৪। বিনয়-পিটক, ১ম খণ্ড, মহাবগ্‌গ, ১ম খন্দক।

২৫। পরিশেষ কাব্য।